ধারাবাহিক রচনা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি’ : সমকালে, চিরকালে

অভিজিৎ মাইতি

প্রশ্ন জাগে, এভাবে আকুলতার মাধ্যমে মাকে পেলে, সর্বোত্তম ভালবাসাকে—ঈশ্বরকে পেলে কী হয়? উত্তর দিলেন মা : ‘‘কী হয় ঈশ্বরকে পেলে?... দুটো শিঙ বেরোয়, না, ল্যাজ গজায়? মনটা ফুলের মত হয়ে যায়, শিশুর মত হয়ে যায়, জ্যোৎস্নার মত হয়ে যায়। আর মন পবিত্র হয়ে গেলেই তাতে আলো জ্বলে। জ্ঞানের আলো। সে আলোতেই বিশ্বরূপদর্শন।’’[২১] ফুলের মতো সৌন্দর্য- সুগন্ধিত, শিশুর মতো সরল, জ্যোৎস্নার মতো বেদাগ শান্তশুভ্র মনের খোঁজ মানুষ তো বারেবারে করেছে। এখানে ঈশ্বর, শ্রীমা সারদার মাতৃমমতা আর পবিত্র মানুষের মন একসূত্রে বাঁধা পড়েছে।

চতুর্থত, *সাহিত্যিকের কলমে সাধকের মন* : পবিত্র মানবমন, তাতে জ্বলে ওঠা আলোর সঙ্গে অচিন্ত্যকুমার যোগ করলেন আর একটি অংশ, ‘সেই আলোতেই বিশ্বরূপদর্শন’। এই প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করতে চাই মায়ের জীবনীলেখক অচিন্ত্যকুমারের কথা। ‘বিশ্বরূপদর্শন’ শুনলে প্রথমেই মনে আসে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জুনকে কৃষ্ণের বিশ্বরূপদর্শন করানোর কথা, যেখানে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র অর্জুন কৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন—অভেদজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই অভেদজ্ঞানের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি যেখানে মা সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করছেন। এখানে দেখব লেখককে, যেখানে বিশ্বরূপদর্শনের মতো অভেদজ্ঞানে কলম চলছে অচিন্ত্যকুমারের হাতে :

‘‘কেউ সৌভাগ্যে আরূঢ় হয়েছে, দেখি শ্রীরূপিণী তুমি তাকে কোলে নিয়ে বসে আছ। কেউ প্রতাপে পর্বতায়মান হয়েছে, দেখি ঈশ্বরী-রূপিণী তুমি, তাকে কোলে নিয়ে বসে আছ। কেউ দুষ্কার্য করে নিন্দার ভয়ে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করছে, দেখি হ্রীরূপিণী তুমি তাকে বসে আছ কোলে নিয়ে। তোমার কোল ছাড়া আর স্থান নেই। যে বুদ্ধিবলে বিশ্বজগতকে প্রতিভাত দেখি তুমি সেই বুদ্ধিরূপে বিদ্যমান। আবার যখন জগৎসত্তা ছেড়ে অনুভব করি শুধু আত্মসত্তা তুমি তখন আবার সেই স্বচ্ছ নির্মলবোধ। ধ্যানমন্থনে অখণ্ডানন্দ। যখন দেখি কেউ প্রকাশকুণ্ঠিত হয়ে আছে, রহস্যটি সম্পূর্ণ

উন্মোচিত করতে চাইছে না, মনে হয় তুমি লজ্জারূপে বিরাজ করছ। যখন দেখি কারু প্রতিপত্তি, ভুলতে পারি না এ তোমারই পালন-পোষণ। যখন দেখি কারু সন্তোষে নিবাস, দেখি তোমারই সেই অম্লান রাজমুকুট। যখন দেখি কেউ জগতের সুখদুঃখের অতীত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আত্মজ্ঞানে তখন বুঝি তুমিই শান্তি। প্রতিকারের শক্তি থেকেও যখন দেখি কেউ অনায়াসে সহ্য করছে অপকার তখন দেখি তুমিই ক্ষমা, তুমিই সর্ববরদা মধুমধুরা করুণা।”[২২]

এমন কথা যিনি লিখতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই সাহিত্যসাধনার মধ্য দিয়েই পৌঁছে গেছেন মাতৃসাধনার কাঙ্ক্ষিত আঙিনায়। সংগীতশিল্পী তিনকড়ি একদিন এমন চমৎকার গান শুনিয়েছিলেন যে, মা সমাধিস্থ হয়ে যান। সেই তিনকড়িকে মা বলেছিলেন, কণ্ঠে সরস্বতীর করুণা, চোখে রাধিকার অশ্রু, হৃদয়ে দ্রৌপদীর ভক্তি—তাহলে ‘তোকে আর পায় কে!’[২৩] আমরা মায়ের অনুসরণে ভাবতে পারি, যাঁর কলম থেকে এমন অনুভব রূপ পায় তাঁকে পায় কে—তিনি তো সাধারণ সন্তান নন! গিরিশকে শ্রীরামকৃষ্ণ কলম ছাড়তে নিষেধ করেছিলেন, কলমচি হওয়াও যে কর্মযোগ হতে পারে সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন কলমের মধ্য দিয়ে ‘জনসেবা’র কথা, অনন্তের বার্তা সমকালীন এবং পরবর্তী কালের মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়ার কথা। মায়ের সন্তানপ্রেম ও সন্তানের মাতৃনির্ভরতার কথা যেভাবে অচিন্ত্যকুমার তাঁর পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তাতে সাহিত্যিক ও সাধক একাসনে ধরা পড়েছেন, পাঠককে ধন্য করেছেন।

অচিন্ত্যকুমার যখন মা সারদার জীবনী লিখলেন তখন মায়ের জীবন ও জীবনের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা একটি মাতৃদর্শন সবে ঘনিষ্ঠ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে সর্বজনের জন্য বিতরিত হচ্ছে, বিভিন্ন স্মৃতিকথার মধ্য দিয়ে। অল্প কিছু পরে পূর্ণাঙ্গ জীবনীর মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বহুজনের আয়ত্তের মধ্যে এসে যাচ্ছেন, জানার-বোঝার-আলোচনার-উত্তরাধিকারচর্চার জন্য। এইরকম সময়ে অচিন্ত্যকুমার আধুনিক সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে মা সারদার ভাবজীবনকে রচনা করে আধুনিক সাহিত্যিকের মননের, সৃষ্টি-সম্ভাবনার ভিন্ন একটি দিককে উন্মোচিত করেছেন। এই ক্ষেত্রটিতে, মানুষের মনের বহু বৈশিষ্ট্য, বহু প্রবণতাকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করার সময় একজন সাহিত্যিক খেয়াল রাখতেই পারেন যে, ধর্ম তথা আধ্যাত্মিকতা মানবমনেরই একটি প্রবণতা এবং সেই প্রবণতা মানবসভ্যতায় কেমনভাবে মানুষের অন্তর্লোকের শ্রেষ্ঠ প্রান্তসীমাকে ছুঁতে পারে, অতিক্রম করে যেতে পারে। আবার মা সারদার জীবনে মানুষের মনের যে-অধ্যাত্মমুখী প্রবণতাটির শ্রেষ্ঠ রূপ তৈরি হয়েছিল সেই রূপকে সাহিত্যে আঁকার চেষ্টার দ্বারা একজন সাহিত্যিক আসলে ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম-অভিযাত্রার সাধনাটি করতে পারেন—এই দৃষ্টান্তও অচিন্ত্যকুমার রেখে যেতে পেরেছেন; বাঙালিকে সেই সাধনার পথে চলার প্রেরণাও জুগিয়েছেন।

সাহিত্যের সংরূপের দিক থেকেও অচিন্ত্যকুমার, মা সারদার মতো মহৎ জীবনকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করে জীবনী-উপন্যাসের এমন একটি ধরন তৈরি করছেন, যা এ-বিষয়ে আধুনিক যে-কোনও ইচ্ছুক সাহিত্যিকের কাছে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত তৈরি করছে। মধ্যযুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থে সাহিত্য ও শাস্ত্রীয় তত্ত্ব একাধারে পরিবেশিত হয়েছে, কিন্তু তা সন্তজীবনী। অচিন্ত্যকুমারের গ্রন্থটি সন্তজীবনী নয়, জীবনী-উপন্যাস। পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যে এইধরনের জীবনী-উপন্যাস অনেক রচিত হয়েছে। সেদিক থেকে অচিন্ত্যকুমার অগ্রজের ভূমিকা পালন করেছেন।

সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় অচিন্ত্যকুমারের বিষয় নির্বাচনটি। উল্লেখ্য, শুধু মা সারদার জীবন নয়—শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, চৈতন্যদেব, যিশু প্রমুখ মহাপুরুষদের জীবন ও কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন তিনি। আমরা অচিন্ত্যকুমার যুগের প্রেক্ষাপট আলোচনার সময় দেখেছি, কেমনভাবে নানা কারণে তাঁর সমসময়ে ভাঙন শুরু হয়েছে মানুষের বাইরের জীবনে, ভাঙন ধরেছে মননময় ভেতরের জীবনে। অবশ্যই সেই ভাঙনের উচ্চকিত ধ্বনিতে বধির হয়ে সর্বনাশার গান শুনিয়েই যে সেকালের কবি-সাহিত্যিকরা থেমে গেছেন এমনটা নয়। মানুষের বাঁচার নতুন ঠিকানার খোঁজে শুরু হয়ে গেছে গণঅভ্যুত্থানের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের খোঁজে মার্কসীয় চিন্তাচেতনা সমগ্র বিশ্বের মতো বাঙালি মননক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে। আরও কত চিন্তা-মনন-মতবাদ-স্বপ্নদর্শন আশার আলো বয়ে নিয়ে এসেছে মানুষের বাইরের ও ভেতরের জীবনকে একটি বিশ্বাস আর প্রত্যয়ের ভূমিতে দাঁড় করাবে বলে। জীবনানন্দ মনে করেছেন, পৃথিবী এখন গভীরতর অসুস্থ হলেও পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে, যদিও তা অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ।[২৪] সমকালে দাঁড়িয়ে অলীক কল্পনা বলে মনে হলেও সেই কল্পনাতেই এমন আশা সাজিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র যে, এই মানুষই একদিন পৃথিবীর ইতিহাসে রেখে যাবে সূর্যাংশের শাশ্বত স্বাক্ষর।[২৫] অথবা বিষ্ণু দে বলিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করছেন সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় একদিন বন্ধ্যা সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হবে।[২৬] সাহিত্য, সমাজবিদ্যা, সংস্কৃতিচর্চা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে এভাবেই মানুষ কত না বাঁচার পথের সন্ধান করছে। সেগুলির গুরুত্ব স্বীকৃতিও পেয়েছে। ঠিক এইসময় মোটামুটি বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক থেকে গ্রামবাংলার ক্ষুদ্র পল্লীতে এবং কলকাতার ক্ষুদ্র বাসস্থানে বসে একজন মা আশ্বাস বাণী শোনাচ্ছেন, ‘‘যারা এসেছে, যারা আসেনি, যারা আসবে, আমার সকল সন্তানকে জানিয়ে দিও, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে’’—এই আশ্বাসবাক্যের মধ্যে কোনও fallacy নেই, কোনও অস্পষ্টতা নেই, কোনও ধোঁয়াশা নেই। সবার জন্য, সব সমস্যার জন্য একজন মায়ের আঁচল আছে যেখানে কোনও ভেদভাব নেই, যেখানে বুদ্ধিদগ্ধ মনোবিকলনের গলিত জৈবতা মায়ের কোলের অপার স্নেহধারা মেখে প্রশ্নহীন তৃপ্তিতে প্রশমিত হয়ে যায়, একাকিত্বের হতাশা সম্পর্কের আস্থায় নিজের অস্তিত্বে আনন্দ খুঁজে পায়। অমর্ত্যলোকের যে-বার্তাটি মা শোনান সেটি কোনও আকাশকুসুম আলিম্পন রচনা করে থেমে যায় না, নিজের ভাবনাকে-অস্তিত্বকে-কল্পনাকে বড় করে দেখে, বাইরের পৃথিবী থেকে কোনও ধর্মমন্দিরে বা গিরিগুহায় নিজেকে লুকিয়ে রেখে জনারণ্য থেকে মুখ লুকায় না বা সাধারণ কিছুর মতো ক্ষণিক মুক্তির

সন্ধান দিয়ে প্রাথমিক শিহরণের শেষে দুঃখে প্রত্যাবর্তন করে না। বরং এই মাতৃদর্শন এই মাটির পৃথিবীতে মানুষেরই দেবতা হয়ে ওঠার আনন্দসন্ধান এনে দেয়; বিশ্বচরাচরের রহস্যময়তায় দিক্‌হারা মানুষের মনে মাতৃদর্শন, কঠিনকে সহজে বুঝতে পারার এবং মেনে নেওয়ার স্মিততা এনে দেয়, যাতে না-বুঝতে পারা আতঙ্কিত মন আর দিবারাত্র অসহায় পীড়ায় শ্রান্ত হয়ে যায় না; এই মত, এই পথ জনারণ্যে নির্জনতার শিক্ষা দেয়; সংশয় ঘুচিয়ে স্বার্থপরতা নাশ করে, অভেদদর্শনে পৌঁছনো সম্ভব বলে নিঃসংশয় পথনির্দেশ করে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অচিন্ত্যকুমারের মা সারদাকে আবিষ্কার তাই নিছক ধর্মাচরণ নয় বরং একজন সাহিত্যিকের মানসযাত্রার পরিণত ফসল। সাহিত্যের পথে যে-মানসযাত্রা যৌবনের প্রারম্ভ থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত কোনও সুস্থিত পৃথিবীকে দেখে যেতে পারেনি, সেই মানসযাত্রায়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবনে যুগগত প্রভাবে যতগুলো সুর উঠেছিল, যতগুলো প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, সবগুলোকেই নিজের মতো করে ধরতে চেয়েছেন। প্রবৃত্তির উন্মাদনা, অবিশ্বাসের কূটগ্রন্থি, সন্দেহের বক্রতা, দারিদ্র্যের ভগ্নতা, সম্পর্কের ভাঙন, বিশ্বচরাচরে জীবনের অনিশ্চয়তার ভীতকণ্ঠ আবার তারই মধ্য থেকে স্বপ্নসন্ধানের যাবতীয় মানব- প্রয়াস, সবই তিনি দেখেছেন, বুঝেছেন। কিন্তু পথ পেয়েছেন মায়ের ডাকে, যে-ডাকের আদি উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই ডাক যেদিন প্রথম শুনলেন সেদিন, ‘‘আর কোনো কাজে মন তেমন বসে না।’’[২৭] এই নতুন মনটির কথা আমরা আগেই বলেছি। এখানে কেবল বলতে চাই, এই নতুন মনটি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আলোচনা খুব বেশি হয়নি। এই নতুন মনকে আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়ার কেন দরকার সেই কথাই এই আলোচনার শেষতম প্রসঙ্গ।

একজন সাহিত্যিকের মননক্ষেত্রের এই বদলটি, ধর্মের ক্ষেত্রে বদল বলেই যদি আমরা সাহিত্যের আলোচনা থেকে বাদ দিয়ে দিই, তাহলে মানুষের মননের ঊর্ধ্বমুখী অভিযাত্রাকে খণ্ডিতভাবে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ব। এই বদলকে, অসমাধানযোগ্য যুগযন্ত্রণার থেকে লেখকের ক্ষণিক পলায়ন বলে সন্দেহ করলে বা ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক প্রচেষ্টা বলে উপেক্ষা করলেও ভুল করা হবে। সাহিত্যের মধ্যে অধ্যাত্মচর্চার মহনীয়তা কোন উচ্চতর সাহিত্যের জন্ম দিতে পারে, সেই খোঁজও থেকে যাবে আমাদের আয়ত্তের বাইরে। প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি চিঠিতে অচিন্ত্যকুমারকে লিখেছিলেন, অল্প সুখে তুষ্ট হয়ে ‘‘ভূমার খোঁজে যেন আমরা না নিরস্ত হই।’’[২৮] এই ভূমার সন্ধানটি বাঙালির জীবনে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বহাল থাকলেই শ্রীমা সারদার আহ্বান শোনা সম্ভব হবে এবং অচিন্ত্যকুমারের পরবর্তী উত্তরাধিকারচর্চাও বলিষ্ঠ হবে। এলিয়ট বলেছিলেন Tradition বা ঐতিহ্যের কথা, যেখানে একজন কবি যখন তাঁর অতীত ঐতিহ্যকে স্বীকার করেন তখন তিনি এই পৃথিবীতে নাম-না-জানা আদিকবির জন্মের ঊষালগ্ন থেকে, পরবর্তী কালে যত কবি জন্মেছেন, তাঁদের সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত হয়ে

যান।[২৯] অচিন্ত্যকুমার যখন সদ্য ইতিহাস হওয়া মা সারদার জীবনের অধ্যাত্ম-তাৎপর্যকে বোঝার চেষ্টা করেন তিনিও কি আসলে যুক্ত হয়ে যান না, পৃথিবীতে আধ্যাত্মিকতা অনুভবের প্রাচীনতম ঐতিহ্যের সঙ্গে? নিশ্চয়ই শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে, প্রাচীনতম আধ্যাত্মিকতার দেশ ভারতবর্ষের সনাতন আধ্যাত্মিকতার সংযোগসূত্র খোঁজা যেতেই পারে। ধর্ম তথা আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত সাধক বা ভক্তদের গবেষণায় সেই সংযোগসূত্র খুঁজতে দেখা যায়। কিন্তু সাহিত্যের আলোচনার দিক থেকে সেই অনুসন্ধান আজও ভবিষ্যতের দিকে পথ চেয়ে অপেক্ষমাণ হয়ে আছে। যদি সেই অনুসন্ধান কখনও শুরু হয়, তাহলে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার প্রবহমানতার ঐতিহ্যের সঙ্গে, বাংলা সাহিত্যে প্রকাশিত আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসের সংযোগসূত্রটির খোঁজ করতে হবে। সেদিন হয়তো দেবনির্ভর প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা, ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সূত্রে নতুন করে ব্যাখ্যাত হবে এবং আধুনিক মানব ও মানবমন-নির্ভর বাংলা সাহিত্যে বিধৃত ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কৃত হবে। সেই আবিষ্কারে আধুনিক কালের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, কমলকুমার মজুমদারদের মতো অনেক সাহিত্যিকের সাহিত্যেই ডুব দিতে হবে। সেই ডুব দেওয়ার কালে নিশ্চয়ই 'পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি' এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আলাদা করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবেন। ✠ *সমাপ্ত*

তথ্যসূত্র

২১। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি* (সিগনেট প্রেস : কলকাতা, ২০১৮) পৃঃ ১৬২

২২। তদেব, পৃঃ ৩০

২৩। তদেব, পৃঃ ৮৮

২৪। *জীবনানন্দ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, অন্তর্গত 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের 'সুচেতনা' (ভারবি : কলকাতা, ২০০৫), পৃঃ ৫২-৫৩

২৫। *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র কবিতা*, অন্তর্গত 'অথবা কিন্নর' কাব্যগ্রন্থের 'জ্যোতিষ্ক সত্তা' (গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, ১৯৮৯), পৃঃ ১৫০-৫১

২৬। *বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা*, অন্তর্গত 'সন্দ্বীপের চর' কাব্যগ্রন্থের 'চৈতে-বৈশাখে' (দেজ পাবলিশিং : কলকাতা, ২০০৪), পৃঃ ৮৫-৯০

২৭। অচিন্ত্যকুমার একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''তবে সত্যি কথা আমি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আগে কিছুই পড়াশুনো করিনি। জানতামই না লোকটা এত বড় কবি। সহজ ভাষায়, এমন আধ্যাত্মিক ভাব তোমার বুকের ভেতর জাগাতে পারে যে মানুষ, সে বড় কবি নয়?'' সাক্ষাৎকার সংগ্রাহক এরপর লিখছেন, ''মোটকথা রামকৃষ্ণের সহজ, সরল, সুন্দর এবং নির্বাসিত সারের মতো ভাব ও ভাষার অনুপম অভিব্যক্তিই অচিন্ত্যকুমারের কবিমনকে অভিভূত করে তুলল। ব্যাখ্যাতার লেখনী নিয়ে তিনি উপলব্ধিকে লিপিবদ্ধ করতে থাকলেন। একসময় এমন হয়ে দাঁড়াল যে, আর কোনও কাজে মন তেমন বসে না।'' *কথাসাহিত্য পত্রিকা*, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, অন্তর্গত 'জীবনের সমগ্রতা ও অচিন্ত্যকুমার', মাঘ ১৪১০, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭৯

২৮। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ* (এম সি সরকার এন্ড সনস্ প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, ১৪০৯), পৃঃ ৯

২৯। T. S. Elliot, *Selected Essays*, (Faber and Faber Limited : London, 1932), p. 14